এক যে ছিল কন্যে

সুশান্ত ভট্টাচার্য্য (স্যান্টো)

[সুশান্ত যিনি স্যান্টোদা নামে অধিক পরিচিত, পেশায় ডাক্তার ও নেশায় পর্বতারোহী হলেও নিজেকে ট্রাভেলার বলতে বেশি পছন্দ করেন। তাঁর কীর্তি ও খ্যাতির কথা অনেকেরই জানা; এনার হাতে কলমটি ছোটে বেগবান অশ্বের মতো। সাধারণত অভিযান বৃত্তান্ত লেখেন, কিন্তু গল্পকার হিসেবেও তিনি অনবদ্য। পাহাড়ি ভূদৃশ্যে ও জনপদে যাদের সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়, মনে ধরে – তাদেরই দুয়েকজনকে নিয়ে লিখেছেন মাঝে মধ্যে। এখানে তিনি রোমান্টিক, এবং একটু মিস্টিকও বটে।]

ভীষণ হিংসে হয় ডক্টর ডুলিট্‌লকে।

রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে এক সময় রোজ ‘ডক্টর ডুলিট্‌ল’ সিরিজের বই নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে পড়তাম। ওগুলো হিউ লফ্টিং এর লেখা ছোটদের বই, কিন্তু জমজমাট মজার।

প্রসঙ্গত একটা চুটকি মনে পড়ে গেল। এক চলচ্চিত্র স্টুডিওর বাইরে আবর্জনার মধ্যে দুটো ছাগল স্টুডিওর ফেলে দেওয়া জঞ্জাল চিবিয়ে খাচ্ছিল (ছাগলে কী না খায়) । একটা ছাগল একটা ফিল্ম এর গোটা রিল খেয়ে ঢেঁকুর তুলে তৃপ্তির সঙ্গে বলেছে,'মাইরি ছবিটা দারুন হয়েছে'। দ্বিতীয় ছাগলটা একটা বই চিবোতে চিবোতে মন্তব্য করছে, 'বইটা আরও ভালো'।

আমার দশা তেমনি। বেশ কয়েক বছর পর ‘ডক্টর ডুলিট্‌ল’ সিনেমাটা দেখেছি। কিন্তু ওই দ্বিতীয় ছাগলের মতন ছবিটা তেমন পছন্দ হয়নি। বরং লফ্টিং এর লেখা বইগুলোই আরো আকর্ষণীয় লেগেছে।

হিংসে হবে না! ডাক্তার ডুলিট্‌ল সব পশুপাখির ভাষা বুঝতে পারতেন। কথা বলতে পারতেন মনুষ্যেতর প্রাণীদের সঙ্গে।

এক সময় তো ডাক্তার নিয়মিত জলে গলা ডুবিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে শামুকের ভাষাও শিখতে শুরু করেছিলেন। পাড়ার মুচির ছেলে টমি স্টাবিন্স ডাক্তারকে সাগ্রহে প্রশ্ন করেছিল, ‘শামুকের ভাষা শিখছেন কেন?!’

‘আ – হা’ ডাক্তার অবাক হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, এত সহজ ব্যাপার। কিছু প্রজাতির শামুক পৃথিবীর সবথেকে পুরনো প্রাণী, এটা তো অনেকেরই জানা। আজও এদের দেহাবশেষ পাথর হয়ে আঁকা রয়ে গেছে পাথরেরই বুকে, সহস্র বছরের পুরানো জীবাশ্ম হয়ে। যদি এদের ভাষা শিখতে পারি, কথা কইতে পারি এদের ভাষায়; তবে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে যুগ যুগান্তর আগের পৃথিবী কেমন ছিল তা, জানা সহজ হয়ে যাবে। জাদুঘরে যতবারই গেছি, জীবাশ্ম দেখলেই আমার মন সহস্র বছর পিছিয়ে উদ্দেশ্যহীন ডানা মেলে ভেসে বেড়ায় আশ্চর্য সব জায়গায়।

ফিউম্যারোলস-এর ধোঁয়ায় অস্পষ্ট বিশাল জলাভূমিতে, অচেনা মহীরুহদের আবছা অরণ্যের অন্ধকারে, যেখানে মাটি কাঁপিয়ে ঘুরে বেড়ায় তেশিঙ্গে ট্রাইসেরাটপ্‌স, একিনোভন ধরে ছিঁড়ে খায় রাক্ষুসে টি-রেক্স, অজানা গাছের শাখায় গলা বাড়িয়ে পাতা চিবিয়ে যায় মহাকায় ব্র্যাকিওসরাস কিংবা চামড়ার বিশাল ডানায় আদিম আকাশ ঢেকে উড়ে আসে টেরোড্যাকটিলের ঝাঁক। কল্পনার স্বপ্নিল রাজ্যে কখনো স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি, কোনো পাথরে গুহার গোপন আস্তানায় মাংস পুড়িয়ে খাওয়া প্লিসটোসিন যুগের নগ্ন নিয়েনডারথ্যাল পরিবারকে।

কে জানে, হয়তো কুড়ি হাজার বছর আগে, তুষার যুগে, পাথরের ফলার বর্শা নিয়ে, স্মাইলোডনের চামড়া পড়ে এই আমিই একদিন শিকার করে বেড়াতাম অতিকায় লোমশ ম্যামথকে। আহা, যদি পারাহিও নদীর পাড় থেকে কুড়িয়া আনা অ্যামোনাইটের প্রাচীন ফসিলটা আমায় শোনাতে পারতো পুরনো পৃথিবীর অজানা ইতিহাস!

কাজার 'টাশি ডেলেক' হোটেলে ডর্মিটরির বিছানায় শুয়ে শামুকের ফসিলটা অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে দিব্যি কল্পনার রাজ্যে উড়ে বেড়াচ্ছিলাম। এবারে 'ইনস্টিটিউট অব ক্লাইম্বারস্ অ্যান্ড নেচার লাভারস্ সংস্থার তরফ থেকে 'দেবসা ভ্যালি এক্সপ্লোরেশান' অভিযানে ওই শামুকের জীবাশ্মটাই আমার সবচাইতে বড় পাওনা।

মানালি এসেই আমাদের একেবারে হচপচ অবস্থা। অভিযানের পোর্টার নেই! আমাদের পরের প্রজন্মের পর্বতারোহীদের মত যাবার আগে থাকতেই পোর্টার 'বুক' করবার দস্তুর তখন অধিকাংশ অভিযানেই ছিল না। একমাত্র ভগোয়ান সিং ছাড়া মানালির আতিপাতি খুঁজেও আর কোন পোর্টারের সাক্ষাৎ পাইনি। আমার আর বিভুজিতের পরিচিত রিক্‌জিন, যোগরাজ, আলম, কিংবা তাশিরা সে সময় বিভিন্ন অভিযানে বেরিয়ে গেছে। মানালির এজেন্সিগুলোতেও খোঁজ করে একই নিরাশার জবাব পেয়েছি, 'স্যরি স্যার। অভি মটরকা সিজন চল্‌রহা হ্যায়। গাঁওবালে খেতি মে কামমে লগে হুয়ে হ্যায়। অভি পোর্টার মিলনা নামুমকিন...।'

মানালির এক বৃদ্ধ মেষপালক অবশ্য কিছুটা আশার কথা শুনিয়েছেন, 'আপলোগ গ্রামফু চলে যাইয়ে। শায়দ উহাঁ পোর্টার মিল যায়েগা।' 'শায়দ' এর উপর ভরসা না করে গত্যন্তর ছিল না।

এদিকে মানালি থেকে অভিযানের কেনাকাটা বা লোকাল পারচেজ বাকি রয়ে গেছে। শেষমেষ রাতের 'টিম মিটিংয়ে' ঠিক হলো; আমি আর বিভু পরদিন গ্রামফুতে রাত কাটিয়ে এবং পোর্টারের খোঁজ করে পরের দিন কাজা চলে যাব। বাকি সদস্যেরা দুদিন পর মানালি থেকে সরাসরি কাজায় চলে আসবে।

ভাগ্যিস, গ্রমফুতে তিনজন পোর্টারের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কাজায় পৌঁছেই শর্মার হোটেলের ডর্মিটরিতে আমাদের লটবহর গুছিয়ে রাখার পর বিভুজিৎ বলল 'বাকিরা রাতের আগে পৌঁছবেনা। চল্, বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ার আগে কোথাও গিয়ে ডান হাতের কম্মোটা সেরে আসি।' স্পিতি নদীর পাশে কাযা বা কাজা হচ্ছে পশ্চিম হিমালয়ের দুর্গম লাহুল আর স্পিতি জেলার মহকুমা শহর। এতক্ষণের তিব্বতী রুক্ষতা ধরে যাত্রা শেষে এখানেই কিছুটা সবুজের ছোপে শ্যামল সমতল।

দুর্গম বিশেষণটা যে প্রবলভাবে সত্যি সেটা এখানে আসবার পথেই দেখে নিয়েছি। স্পিতি নদীর সহস্র ফুট উপরে একদিকে ধসপ্রবণ পাহাড়ের কালচে-লাল দেয়াল, ভাঙাচোরা ভয় ধরানো গাড়ির রাস্তা । অন্যপাশে, স্পিতির ওপারে একটানা অবক্ষয়িত ধূসর পর্বত শ্রেণীর পাদদেশে সারসার 'আর্থ্ পিলার' ভয়ংকর ভাবে নদীর দিকে হেলে আছে।

এখানকার অধিকাংশ গাছই উইলো কিংবা পপলার। আঞ্চলিক ভাষায় উইলোর নাম 'বানস্'। আমি আর বিভু শর্মার হোটেল থেকে বেরিয়েছি, কোনও শস্তার রেস্তোরাঁর খোঁজে। এটা নয় ওটা নয় করে আমরা বেশ ক'টি রেস্তোরাঁকে নাকচ করে উইলো গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে স্পিতি নদীর দিকে এগিয়েছি। এদিকে অনেকগুলো তিব্বতিদের বসতবাড়ি। সেগুলোর একাংশ সাজিয়ে গুছিয়ে রেস্তোরাঁর রূপ দেওয়া হয়েছে। সামনের বড় ঘরটা রেস্তোরাঁ, লাগোয়া ছোট্ট কিচেন, একদম পেছনে টাঙ্গানো পর্দার ওপাশে সংসারের প্রাইভেসি।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। কাজল কালো আকাশ নক্ষত্রের লক্ষ হীরের দ্যুতিতে ভরে গেছে। ছড়ানো

ছেটানো মণিমুক্তোর মত টিপটিপ করে জ্বলে উঠেছে কাজার দোকানপাট, হোটেল, বাড়িঘর আর পাহাড়ের গায়ে গায়ে বিচ্ছিন্ন গোম্ফার আলো। আমি আর বিভু কাজার আধুনিকতার সীমা ছাড়িয়ে শহরের প্রায় শেষ প্রান্তের একটা রেস্তোরাঁয় নাক গলিয়েছি।

শস্তা হলে কি হবে, দিব্যি তক্ তকে রেস্তোরাঁ। দেয়ালে রঙিন থংকায় নানান শুভচিহ্ন, বিভিন্ন মনাস্ট্রির এন্‌লার্জড ফটোগ্রাফ, পোতালা প্রাসাদের বিরাট ছবি। অসংখ্য চেনা অচেনা বরফঢাকা পাহাড়ের বিরাট কিছু পেইন্টিং। প্রবেশদ্বারের ওপরই তুষার শুভ্র কাজার একখানা দুর্দান্ত ল্যান্ডস্কেপ। একপাশে কাউন্টারের ওপর বড়সড় একটা মিউজিক সিস্টেমে হালকা ভলিউমে বাজছে গ্লেন ক্যাম্পবেলের গাওয়া 'রাইনস্টোন কাউবয়'। কাউন্টারের পেছনে বড় বড় ইংরেজি হরফে ঘোষণা, 'স্পিতিয়ান ফুড এভেইল্‌বেল হিয়ার।' ওখানেই একটা চেয়ারে নীল জিন্স্ আর জিপার-বহুল কালো চামড়ার জ্যাকেট পরা তিব্বতি মালিক। এক-কানে সম্ভবত হীরে বসানো সোনার দুল।

রেস্তোরাঁর ঘরটিতে প্রায় দশটা করে টেবিল। প্রতিটি টেবিল ঘিরে চারটে করে চেয়ার।

এ সময় কাজা ফাঁকা ফাঁকা হলেও সাহেব সুবোদের অভাব নেই। তিনটে টেবিল ঘিরে বিদেশিরা বসে চাউমিন কিংবা মোমো গলাধকরণে ব্যস্ত, সঙ্গে গেলাস ভরা রাম কিংবা ব্রান্ডির আয়োজন। সবাই অলস আড্ডায় মশগুল।

আগুন ওগ্‌রানো ড্রাগন আঁকা মেনুর কার্ডে চোখ বুলিয়ে বুঝলাম মিক্সড সুপ, চাউমিন, মোমো, থুকপা আর লাদাখি সিডু ছাড়া বাকি নামগুলো আমাদের দুজনেরই অচেনা। বিভুজিৎ অবশ্য ঘোরোতর মোমো-ভক্ত, দু প্লেট ইয়াক মোমোর অর্ডার দিয়ে আমরা দেয়াল ঘেঁষা একটা টেবিল দখল করে বসলাম। এখান থেকে জানালা দিয়ে একফালি বাঁকানো ঝক্ ঝকে রুপোর পাতের মতন স্পিতির প্রবাহের অনেকটা নজরে পড়ে। নদীর ওপারে কালচে শরীরের বিরাট পাহাড়েরা তারাদের সাথে সোহাগী পরামর্শে তন্ময়।

নজরে পড়বার মতো দৃশ্য আরেকটাও ছিল। সেটা অবশ্য রেস্তোরাঁর ভেতর।

একটা মেয়ে। সম্ভবত কাউন্টারে বসা মালিকেরই মেয়ে। দুজনের হাসিতে একটা প্রচ্ছন্ন সাদৃশ্য আছে। মেয়েটার বয়স চব্বিশ-পঁচিশ এর সামান্য এদিক-ওদিক। চাইনিজ পুতুলের মতো পনিটেল বাঁধা রেশমি চুল সামনে ভুরু বরাবর এসে থেমেছে। বেশ টাইট একখানা নীল সাদা ডোরার হাইনেক সোয়েটার, ততধিক টাইট জিন্সের 'হিপ হাগার' প্যান্ট, পায়ে ইঞ্চি দুয়েক স্টিলেটো হিলের কালো স্যান্ডাল।

মেয়েটাই এ টেবিল থেকে ও টেবিলে পানীয় আর খাবার পরিবেশন করছে। 'মুঘলে আজম' হলে নির্দ্বিধায় বলতাম 'সাকি'। চোখে পড়বার মতো ফিগার। তাও এই পাণ্ডব বর্জিত তল্লাটে! কিন্তু যে জন্য মেয়েটাকে আমার মনে ধরেছে, সেটা ওর হাসি। প্রতি টেবিলেই অর্ডার নিতে এসে মেয়েটি 'বাও করবার ভঙ্গিতে, সামান্য ঝুঁকে, এক ঝলক হাসির বসন্ত ছড়িয়ে 'ইয়েস স্যার'বলছে। দুদিকে দুটো গজ দাঁত থাকায় ঝকঝকে দাঁতের ওই হাসি আরও দুর্দান্ত দেখাচ্ছে।

শুধু তাই নয়, বিভুজিত মুখের মোমোটা আয়েশ করে চিবোতে চিবোতে মন্তব্য করেছে, 'সবাই চোখ দিয়ে মেয়েটাকে গিলছে। সাধে কি আর এই অফ্-সিজনে এখানে টুরিস্টদের অত ভিড়। এই মালিকটা স্মার্ট বিজনেসম্যান। বাস্তবিকই; চারিদিকে টেবিলে বসা প্রায় সবারই নজর মেয়েটির দিকেই ঘুরে ফিরে যাচ্ছে। মেয়েটিকে নিয়ে নেশায় আবিষ্ট কিছু বিদেশী যুবকের সামান্য ফষ্টিনষ্টও আমার নজর এড়ায়নি। কাউন্টারে বসার নির্লিপ্ত চোখের মালিককে দেখে মালুম হলো যে লোকটা এ হ্যানো দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত। ইতিমধ্যে ঠান্ডা

আরও একটু ধারালো হয়েছে। আরো একজোড়া বিদেশি খদ্দের পকেটে হাত ঢুকিয়ে জড়োসড়ো হয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকে ব্র্যান্ডির অর্ডার দিয়েছে।

বড় ইচ্ছে ছিল আরো কিছুক্ষণ ওখানে বসব। একে তো মেয়েটাকে দেখে একটা ভালো লাগবার ঘোর এসেছে, আর, বাইরে অপার্থিব পৃথিবী। আশা ছিল একসময় অভ্যাস মত ওই মেয়েটা এসে বাও করে জিজ্ঞেস করতই 'অ্যানি মোর সার্ভিস স্যার?' সেই সুযোগে ওর নামটা জেনে নিতাম।

এসব ব্যাপারে বিভু বড় বেরসিক। ও তাড়া দিল, 'নে চল্, বুড়ো বয়সে অনেক ভীমরতি দেখিয়েছিস। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিজন, অনল, অমিতাভরা এসে পড়বে। আর বেশি দেরি করা ঠিক হবে না'।

তবে মোক্ষম সময়েই উঠেছি। বিভু আর আমি যখন কাউন্টারে মোমোর দাম মেটাচ্ছি, মেয়েটা সামনেই দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে ক্যাম্পবেলের ক্যাসেটটা বদলাচ্ছিল। মেয়েদের ষষ্ঠেন্দ্রিয় বড় প্রবল। চোখের ওপর চুল সরাতে গিয়ে ও আমার দিকে ফিরে তাকিয়েছে। বেশ বুঝতে পেরেছে আমি ওকে লক্ষ্য করছি। সঙ্গে সঙ্গেই মিষ্টি হাসির ঝলসানো বিদ্যুৎ, 'ডু কাম এগেন স্যার।'

ঐ হাসিতে এতটা সম্মোহনী মাধুর্য যে নামটাও জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি।

বাইরে জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছে। কিছুক্ষণ আগের তারকাবৃত আকাশ ঢেকে গিয়েছে মেঘেদের ঘেরাটোপে। রেস্তোরাঁ থেকে বেরোবার সময় শুনতে পেলাম টেপ রেকর্ডারে বিল্লসের,'আই ওয়ান্ট টু হোল্ড ইওর হ্যান্ড' শুরু হয়েছে।

সময় মতই কাজা বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে আধ ঘন্টার মধ্যেই বাকি সদস্যদের দেখা পেয়েছি। মালপত্র বয়ে নিয়ে সবাই ঢুকেছি শর্মার হোটেলের ডর্মিটরিতে। পরদিন সকালেই যাত্রা দেবসা উপত্যকার উদ্দেশে।

**

আমাদের দেবসা উপত্যকার অভিযান অসম্পূর্ণ রয়ে গেলেও, খামেঙ্গার নালার অন্য পাশে, কিনলুং নালার প্রবাহ ধরে ছেরেসাসা উপত্যকায় আমরা পাঁচ হাজার মিটারের ওপর এক অনামা শৃঙ্গ আরোহণ করে এসেছি।

তবে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছি, ভয় ধরানো ঝুর্ ঝুরে স্ক্রি পার হওয়ার সময় কিংবা অনামা শৃঙ্গ আরোহণের পথে বেশ ক'বার আমার ক্লান্তি আর আশঙ্কাকে স্নিগ্ধ সুখের প্রলেপে মুছিয়ে দিয়েছে কল্পনা অধিকার করা ঐ তিব্বতি মেয়েটার হাসি।

সবাই ফিরে এসেছি কাজায়। একটা সাফল্যের নাগাল পেয়েছি বলে সদস্যেরা সবাই ফুরফুরে মেজাজে। ডর্মিটরির মেঝেতেই আমরা বিকেল থেকে মাংস রান্নার তোড়জোড় শুরু করেছি। শুধু মাংসটাই যা কিনতে হয়েছে। আনাজপাতি কিংবা মশলাপাতি পর্যাপ্ত পরিমাণেই রয়ে গিয়েছিল। মাংস, আলু-পেঁয়াজ, রসুন বাটা, স্টোভ ধরানোয় সবাই হাত লাগিয়েছি।

এদিকে আমাদের হাই আলটিটিউড গাইড রাম বাহাদুর কাজার বাজার থেকে ইয়াকের একটা বড়সড় মাংসের দাব্না বিজনের হাতে গছিয়ে বিলকুল বেপাত্তা। বিভু আশ্বস্ত করল 'কোথায় আর যাবে! এখনও তো পুরো পেমেন্ট দিইনি। দ্যাখ, কোথাও বসে ভরপেট দিশি মদ গিলছে।'

রান্না ব্যাপারটা এ জন্মে আমার রপ্ত হল না। আমাদের পার্সি সদস্য নওজার বটলিবালাও তথৈবচ।

ফসিলটা পকেটে পুরে আমি নওজার-এর সঙ্গে টাশি ভেলেক হোটেল থেকে বেরিয়েছি। কাল কাক ভোরেই আমাদের যাত্রা মানালির উদ্দেশ্যে। যেটুকু সময় পাওয়া যায়, কাজাকে দেখে নেয়াই আমার ইচ্ছে।

জাম্বালা রেস্তোরাঁতে দু কাপ চা খেয়ে আমি আর নওজার উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেরিয়েছি। চারপাশে বরফের ছোপ ধরা ধূসর পর্বতশ্রেণী, প্রায় দু তিনশো ফুট উপরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তিব্বতি গোম্ফা, উইলোর এলোমেলো জটলা। পথের পাশেই যত্রতত্র বিক্রি হচ্ছে সদ্য ভাজা, গরমাগরম রক্তের সসেজ, সঙ্গে ঢালাও রক্সির আয়োজন। মাঝেমধ্যেই গর্জন করে এসে থামছে পণ্যবাহী লরি। সভ্যতা ক্রমশ এগোচ্ছে।

এই অবকাশে একটা কিউরিওর দোকান থেকে আমি কিনলাম বোন চায়নার তৈরি একটা ড্রাগন, নওজার বেছে নিল তথাগতর সহাস্য মূর্তি, 'লাফিং বুদ্ধা'।

কিন্তু সেই সঙ্গে কদিনের একটা সুপ্ত ইচ্ছে হচ্ছে হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তা অস্বীকার করব না। কোথায় সেই রেস্তোরাঁটা আর তার টেবিল থেকে টেবিলে, হাই হিলের ছন্দিত শব্দ তুলে 'সার্ভ' করে বেড়ানো দুর্দান্ত হাসির অধিকারিনী সেই তিব্বতি মেয়েটা। বেশ কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরেও ঠাহর করতে পারলাম না যে কদিন আগে কাজায় এসে আমি আর বিভু কোন রেস্তোরাঁটায় মোমো খেয়েছিলাম।

সাড়ে পাঁচটায় নওজার তাড়া দিল 'লেটস গো ব্যাক টু দ্য হোটেল, আই থিঙ্ক ডিনার ইজ অলমোস্ট রেডি।'

আমি নওজারকে একাই ফিরে যেতে বললাম। বড় ইচ্ছে হলো স্পিতি নদীকে আরও কাছ থেকে একা দেখে আসি। পাহাড়ের রাতে নদীরা বড় কাব্যিক হয়ে যায়। মেঘের চাদরে পাহাড় ঘুমিয়ে পড়ে, চারপাশের উইলো আর পপলারদের ঝুপ্‌সি মাথারা নুয়ে পড়ে অলস তন্দ্রায়, আকাশের রেশমি কালো চাঁদোয়ায় তারারাও যেন মিটমিট করে ঝিমোয়। অথচ অতন্দ্র নদী একমনে বয়েই চলে সাগরে ঝাঁপাবার নিরলস সাধনায়।

সভ্যতার ইট-কাঠ-সিমেন্ট পেরিয়ে ফসলের ক্ষেতের সীমা ছাড়িয়ে কাজার এক প্রান্ত একাত্ম হয়ে গেছে উপল, বালি আর বোল্ডারদের বিরাট প্রান্তরে। তারই বুক চিরে গলন্ত রূপোর মতো দেখা যায় আসন্ন সন্ধ্যার বহমান স্পিতি নদীর বিরাট প্রশস্তিকে। আর আমি দূর থেকেই দেখতে পেলাম স্পিতির প্রান্তরে আলেয়ার মত জ্বলা এক টুকরো আগুনকে!

আরও কাছাকাছি আসতে বুঝলাম ওখানে রামবাহাদুর বসে আছে। ওর পাশে রাখা স্তূপীকৃত শুকনো উইলোর ডালপালা, রক্সির বড়সড় বোতল আর প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগে টমেটো সস মাখানো আট নটা রক্তের সসেজ। রামবাহাদুর সসেজ পুড়িয়ে খাচ্ছে। আমায় দেখে সে খুব একটা অবাক হয়নি, ও সম্পূর্ণ নেশাগ্রস্ত বলেই হয়তো এমন জায়গায় আমার দেখা পাওয়াটা ওর কাছে নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যপার। ওর প্রশ্নে তাই খুব একটা অবাক হওয়ার সুর নেই 'আপ ইঁহা...?' 'ব্যাস ইউঁ হি ঘুম রহে থে। তুম যাওগে নেহি হোটেল মে?'

'যায়েঙ্গে দাদা', রাম বাহাদুর আরক্ত চোখে হাসলো, 'হামারা সামিট হুয়া, এক্সপিডিশন খতম হুয়া। অব কেয়া ফিকার হেয়। থোড়ি মস্তি তো কর লেনে দো। আপভি ব্যয়ঠো', রাম বাহাদুর রক্সির বোতল এগিয়ে দিয়েছে, 'পিয়োগে?'

নির্জলা তরল আগুনে চুমুক দিলাম। ওর মন রাখতেই নয়। চারপাশের অসামান্য পরিবেশের ইন্দ্রজালে আবিষ্ট হয়ে। কজন দেখেছে এমন অসামান্য নিসর্গ!

মনে হল অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবে। রক্তের সসেজে কামড় দিয়ে জ্বলন্ত জিভকে সান্ত্বনা দিলাম।

আমাদের মাঝখানে চড়বড় করে পুড়তে থাকা উইলোর আগুনে রামমাদুর কে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিলো। বসন্তের ছোবলে কিংবা ব্রণর আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত মুখ। ওর শ্বদন্ত দুটো বেশি বড় বলে হাসলে মনে হয় সেরেঙ্গেটির সিংহ হাই তুলছে।

এদিকে আমার রক্তে রক্সির আগুন ছড়িয়েছে। কাজার ঠাণ্ডাকেও হঠাৎ সুখকর বলে মনে হলো। সেইসঙ্গে আবারও মনে পড়ল কাজার না খুঁজে পাওয়া রেস্তোরাঁর সেই অধরা মেয়েটার মুখ। রাম বাহাদুরকেই জিজ্ঞাসা করলাম যে ওরকম চেহারার মেয়েটার ও হদিস জানে কিনা।

প্রশ্নটা অবান্তর, কেননা রামবাহাদুর কাজার বাসিন্দে নয়। কিন্তু রাম বাহাদুর নিভন্ত আগুনে আরও কিছু শুকনো গাছের কুটো ফেলতে গিয়ে, হঠাৎ থমকে, কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে হো হো হাসিতে ফেটে পড়েছে। হাসির দমক কিছুটা কমতেই ও বলল, 'তো দাদা আপভি শামিল হো লাইন মে!

'ক্যয়সি লাইন?'

'আরে দাদা, ম্যায় আব তক কাহাঁ থা মালুম?' আরেক প্রস্থ হাসি সামলে রাম বাহাদুর আগুনকে উসকে দিয়ে জড়ানো গলায় বোঝালো, 'আরে উসিকি সাথ। আভি ও সালি ছিরিং কি দুকান মে লেটি পাড়ি হ্যায়।'

রক্সির বোতলে এক চুমুক দিয়ে বিকৃত মুখে কিছুক্ষণ ঝাঁঝ সামলে নিয়ে, থু থু করে একগাদা থুথু ফেলে ও বিষোদগার করেছে, 'য়ো রান্ডি নে সির্ফ এক ঘন্টেকে লিয়ে তিনসো উঠা লায়া মালুম' বিরক্তি ভরা গলায় ও টেনে টেনে বলল, 'তিন - সো'!

বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে আমার কিছুটা সময় লেগেছে। 'তুমহারা মতলব, তুম উস মাসুম লড়কি কে সাথ...?

'হ্যাঁ সোয়া থা', আমার কথা শেষ করবার আগেই রামমাদুর আমায় ঝাঁঝাঁলো গলায় থামিয়েছে, 'অওর কিসে আপ মাসুম ক্যহ্তে হো দাদা। ইয়ে উসকি ধান্দা হ্যায়। বিজনেস, মালুম, বিজনেস' - রাম বাহাদুর বাঁ হাতের মধ্যমা আর বুড়ো আঙ্গুলে টাকা গোনার মুদ্রা দেখিয়ে জানালো 'রূপেয়া কেয়া চিজ দাদা। ইয়ে বাপ বেটি ডলার মে কামাতে হ্যায়। জেরা টুরিস্ট সিজন তো আনে দো। গোরে চামড়ে ওয়ালে ফিরঙ্গিয়োঁ কো আনে দো। আজ সালিকি গ্রাহক নেহি থে না তিনশো মে রাজি হো গ-ঈ।'

আমাকে চুপ থাকতে দেখে ও আমার কাঁধে খোঁচা মেরে অর্থপূর্ণ হাসি হাসলো, 'যাওগে দাদা মিংমা ইয়াংজি কি পাস? দোসো রূপেয়ে মে মানা লেঙ্গে, পাক্কা ওদ্দা ...।'

তারপর এক চোখ টিপে বললো, 'মেরে লিয়ে এক অওর সও-কা খয়াল রাখনা দাদা।'

মিংমা ইয়াংজি! এই তাহলে মেয়েটার নাম; যার অপাপবিদ্ধ হাসিমুখ কাজা থেকে অনেক দূরের রুক্ষ দুর্গম পথে অনেকবার আমার শ্রান্তিকে শান্তিতে বদলে দিয়েছিল একগুচ্ছ তাজা রজনীগন্ধার সৌরভের মতো!

হঠাৎ করেই মনে পড়ল পকেটে রাখা অ্যামোনইটের জীবাশ্মটার কথা। পকেট থেকে সেটি বের করে আগুনের আলোয় আবার ভালো করে দেখলাম যুগান্তরের শামুকের ফসিলটাকে। হ্যাঁ, ফসিল দেখলেই আমি বড় কল্পনাপ্রবণ হয়ে পড়ি। যেন বহু সহস্র বছর আগেকার এক অচেনা পৃথিবীর কোন গুহায় মাংস পুড়িয়ে খাওয়া আমরা দুজন দুটি হিংস্র কামুক আদিম নিয়েনড্যারথ্যাল মুখোমুখি বসে আছি। রাম বাহাদুর আমার হাতের ফসিলটার দিকে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছে, 'ইয়ে পাথর কাঁহাসে উঠা লায়া দাদা?'

'ইয়ে পাথর নেহি', আমি ওর রক্সির বোতলে একবার লম্বা চুমুক দিয়ে হাসলাম, 'ইয়ে হামারি

আপনি কাহানি হ্যায়।’

আজ ডাক্তার ডুলিট্‌ল পাশে থাকলে নিঃসন্দেহে আমায় হিংসে করতেন। জীবন্ত শামুক নয়; সুদূর অতীতে পাথর হয়ে যাওয়া এক নির্বাক জীবাশ্ম আমায় শুনিয়েছিল অচিন পৃথিবীর নগ্ন ইতিহাস। এক অবিশ্বাস্য আদিম পৃথিবী ছেড়ে আমি বেহিসাবি পা বাড়িয়েছি আলোকোজ্জ্বল সভ্যতার দিকে, টাশি ডেলেক হোটেলের উদ্দেশ্যে। আমার পেছনে স্পিতির পুলিনের তমসাময় রাত ক্রমশ ঘনতর হয়ে হারিয়ে গেছে।